# আমাদের নদী, আমাদেরই নাও

প্রণব সরকার

''অভাগিনীরে মনে রাখিও। ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া রহিল, আমার হাতের কঙ্কন ফেলিযা আসিয়াছি, আমাকে মনে করিয়া দুঃখ হইলে কঙ্কন ও কলসী তোমার হাত দুখানি দিয়া ছুঁইও - হাতে আমি জুড়াইব। আর সুন্দরী দেখিয়া একটি মেয়ে বিবাহ করিও। আমি যে আদর ও স্নেহের জন্য পাগল ছিলাম, তাহা তাহাকে দিও, হতভাগিনীর অদৃষ্টে তাহা নাই।''

পূর্ববঙ্গের পল্লী গীতিকার এই বিবরণটি শুধু মর্মস্পর্শী নয়, এর ভিতরে লুকিয়ে আছে সমাজ - ইতিহাসের গূঢ় প্রসঙ্গ। সম্রাট আকবরের আমল থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ সায়েস্তা খাঁর আমল পর্যন্ত গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে হার্মাদ ও অন্যান্য দস্যুরা জলপথে লুণ্ঠন ও অত্যাচার লীলা চালিয়েছিল। তাদের জাহাজগুলো পরপর সাজিয়ে বজরা তৈরি করত। এর ক্যাপ্টেন ছিলেন বহরদার। এরা ঘাঁটি গেড়েছিল - চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালি, বরিশাল, সন্দীপ ও ২৪ পরগনার উপকূলে। বাজার হাট, লোকালয়ের আক্রমণ চালিয়ে লুঠপাট করত। নরনারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে আরাকানে বিক্রি করত। এমনকি বিদেশেও নিয়ে যাওয়া হতো। একটি বধূ ঘাটে এসেছিল —এমন সময়ে সে মগদস্যুর হাতে ধৃত হয়। কলসী ঘাটেই পড়ে রইল। আর স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে হাতের কাঁকন ঘাটে ফেলে রাখল যাতে স্বামী বা অন্য কেউ এসে সহজেই বুঝতে পারে সে মগের কবলে পড়েছে। এমনি এক হতভাগ্যা লুণ্ঠিতার বিলাপ তার স্বামীর উদ্দেশ্যে। উপরের আখ্যানে তা বর্ণিত।

আমরা 'মগের মুল্লুক' শব্দটি আজো ব্যবহার করি। 'মগের মুল্লুক' বলতে সমগ্র নিম্নবঙ্গকেই বোঝাত।[১] মঙ্গলকাব্যে আছে 'হার্মাদ' শব্দ। পর্তুগীজ 'আরমাডা' শব্দ থেকে এসেছে। হার্মাদ মানে পর্তুগীজ জলদস্যু।

'ফিরিঙ্গী দেশখান বহে কর্ণধরে
রাত্রিদিন বহে যায় হার্মাদের ডরে।'

অতলান্তিক সাগরের তীরে ছোট্ট দেশ পর্তুগাল। রোম সাম্রাজ্যের এই গরীব প্রজাদের তেমন শিক্ষা দীক্ষা ছিল না। দেশ থেকে ইসলাম ধর্মকে উচ্ছেদ করার সময় তারা যুদ্ধজাহাজ চালানোর কলাকৌশল শিখেছিল। এরা এদেশে এসে যে শুধু লুঠপাট চালিয়েছিল তা নয় ধর্মান্তরিতরও করেছিল। তাই শাহজাদা সুজা বলেছিল— ''এক হাতে কৃপাণ, আরেক হাতে ক্রুশকাঠ নিয়ে পর্তুগীজরা ভারতে প্রবেশ করেছিল।'' পর্তুগীজ দস্যুরা ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় করে বড় জাহাজকে ঘিরে ধরত। আবার কখনো পায়ে হেঁটে গিয়ে উৎসব বাড়িতে আক্রমণ করত। তবে নদীপথে আক্রমণে সিদ্ধহস্ত ছিল। অরণ্যে পরিত্যক্ত, পর্তুগীজ দস্যু দ্বারা লুণ্ঠিতা বালিকাই বঙ্গিমের 'কপালকুণ্ডলা'। কলকাতায় ক্রীতদাসদের আড়ত, বাজার তারা তৈরি করেছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'মগরাহাটে' মগদস্যুরা নাকি ক্রীতদাস দাসী কেনাবেচার হাট বসিয়েছিল। যেসব নদনদী, খালবিল, সেকালে ছিল তা আজ আর চোখে পড়ে না। শুধু স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে, কিছু জলাশয়, স্থাননাম, গীর্জা, স্কুল, পুরানো ভগ্ন গৃহ আজও আছে। আছে প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিবরণ। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজার। প্রবাদ - প্রবচন, পল্লীগীতিকা, লোকায়ত আখ্যান। আমাদের অভিধানে পর্তুগীজ শব্দ। কেশচর্চায় ফিরিঙ্গী খোপা। আর মনুষ্যদেহে ফিরিঙ্গী রোগ - কুষ্ঠ ইত্যাদি।

**।।দুই।।**

''হাজার বাণিজ্য নায়
সাগর বাহিয়া যায়।''

বাংলার বণিকেরা নৌবাণিজ্যে কতখানি সক্রিয় ছিল। উপরের উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ মেলে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বাংলা বন্দর, সপ্তগ্রাম, গৌড় - তাম্রলিপ্ত এগুলোর ঐতিহ্য, ব্যবসা - বাণিজ্য নানাভাবে অজস্রবার উচ্চারিত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না - সোনার বাংলার অতীত ঐশ্বর্য, ঐতিহ্য গাথা। পলিমাটির কারণে, নদী, বদ্বীপের প্রাচুর্য। আর জলপথের নৌবাহিনীর উল্লেখ মেলে। আমরা সে কথায় বিস্তারিত না গিয়ে আমাদের নদী আর নৌকার অতীত ঐশ্বর্য ও বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

একাদশ শতকে ভোজরাল লিখিত ( ?) সংস্কৃত গ্রন্থ 'যুক্তি কল্পতরু'[২] গ্রন্থে নৌকার শ্রেণিবিভাগ ও নির্মাণ কৌশল বর্ণিত হয়েছে। দেশের ভেতরে ও সমুদ্র যাত্রার জন্য নির্মিত নৌকাগুলোর পৃথক পৃথক নাম পাওয়া যায়। তেমনি জাতিভেদের ন্যায় কাঠেরও - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু নৌকা নির্মাণ ও পরিচালন সম্পূর্ণ প্রান্তিক মানুষের অধিকারে ছিল। ভোজরাজের নামে প্রচলিত গ্রন্থে লোকায়ত সমাজ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হতে পারে। মধ্যযুগে যুদ্ধ ব্যবস্থার চতুরঙ্গে অন্যতম ছিল নৌশক্তি। ইহা গঠিত হত 'বহরদার' বাঙালি হিন্দু মুসলমান দ্বারা। 'নুরন্নেহার কবর' নামক পূর্ববঙ্গ গাথায় জাহাজের বহর কিভাবে যুদ্ধ করে তার বিবরণ আছে। আমরা নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, এবং অস্পষ্ট সুদূর অতীতে দীর্ঘ আখ্যানগুলির উল্লেখ না করে বিষয় সম্পৃক্ত অদূর অতীতের কথাগুলো আলোচনা করতে পারি। ১৬-২০ শতকের আলোচনা মুখ্য বলে ধরে নেওয়া যায়।

পূর্বে বাঙালির সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। তাই মধ্যযুগের কাব্যে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। চৈতন্য সতীর্থ রঘুনন্দনের ফতোয়ার ফলে হিন্দু তথা বাঙালির 'কালাপানি' পার হওয়ার নিষিদ্ধ হয়। নবদ্বীপের এই নৈয়ায়িক প্রথমে ব্রাহ্মণদের জন্য সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করলেও পরে সমাজের সকলের জন্য তা বলবৎ করেন। কেউ কেউ বলে থাকেন এর মূল্যে ব্রাহ্মণ - বৈশ্য দ্বন্দ্ব মুখ্য।[৩] বহির্বাণিজ্য বিশেষত জলপথে বহির্বাণিজ্য করার ফলে সেকালে বেনেরা এতটাই বিত্তবান হন যে তাদের উপরে ব্রাহ্মণবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা ক্রমাগত কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। তাই তাদের সুকৌশলে অধীনে আনার জন্য রঘুনন্দনের এই কূটকৌশল। অবশ্য এই ফতোয়া অগ্রাহ্য করে যে মহাত্মা রামমোহন, দ্বারকানাথ বিদেশ পাড়ি দিলেন তাঁদের পেছনে যে ইংরেজ প্রভু ও তদনুগত ধনাঢ্য জমিদার শক্তি সহায়তা করেছিল তাদের জোরেই ধর্মধ্বজীরা পিছু হটে ছিলেন। যদিচ দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী স্বামীকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করেছিলেন। একসাথে থাকতে রাজিও হননি। তাতে কী এসে যায়। তিনিই তো সাহেবদের সাহচর্যে আবার আমাদের সাগরে পাড়ি দিতে সাহস যোগালেন।

আচার্য সুকুমার সেন বাঙালির জলপথে বাণিজ্যের ধ্বংসসাধন সম্পর্কে লেখেন : ''গোড়ার দিকে এদেশি বণিকেরা বিদেশে, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের ওপারে, বাণিজ্য কর্মে বেশ তৎপর ছিল। মনে হয় বিদেশী বণিকের তৎপরতা এবং সেই সঙ্গে

জলদস্যুবৃত্তির আধিক্যে আমাদের দেশে বিদেশে বাণিজ্য খর্ব করে দিতে থাকে। রোম আরব ইজিপ্ট প্রভৃতি বিদেশের বণিকেরা এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বাংলাদেশে এসে এখানকার মাল প্রচুর রপ্তানি করতে থাকে। তার ফলে পোত স্বার্থবাহদের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।" (বঙ্গভূমিকা)

অসীম রায়ের 'নবাদবাঁদী' উপন্যাসে এক বাঙালি বণিকের করুণ পরিণতি - উপন্যাসকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। বাণিজ্য থেকে সরে আসার কথাও লেখেন : ''বোধ হয় হুতোমের কল্যাণে আমাদের বেলেল্লাবাবু উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমরা একটু বেশি মাত্রায় সচেতন। সীমিত হলেও আর এক উত্তরাধিকার ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে ক্রমাগত অসম প্রতিযোগিতায় পরাজিত কিছু মানুষের ব্যবসায় বাণিজ্য থেকে পরাজিত নায়কের মতো জোতজমিতে প্রস্থান এক্ষেত্রে স্মরণীয়।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে বণিক শঙ্খ দত্তর চোখ দিয়ে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কে আগাম সংকেত দেন। জানিয়ে দেন আগামী দিনের ভবিতব্য :

''নদীর ধারে খ্রীশ্চানদের বিরাট কুঠি গড়ে উঠেছে। তার সামনে গীর্জা। ব্যবসা আর ধর্মপ্রচার। একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে ওরা।...কুঠীর ঘাটে একখানা জাহাজ নোঙর করে আছে। আর সেই জাহাজ থেকে নামছে একদল খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী।"

জলপথে বাণিজ্যের অতীত ঐতিহ্য ধর্মের ফতোয়ায় বন্ধ হয়ে গেল, প্রাক্ দ্বারকানাথের অনেকগুলো বছরের বাংলা সাহিত্যে জাহাজ করে বিদেশ বাণিজ্যের খবর নেই। অথচ ঘরকুনো হয়ে থাকলে চলবে না। অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে আগ্রহী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। 'তাসের দেশ' নাটকে রোমাঞ্চপ্রিয় রাজপুত্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে বণিকপুত্র। রাজপুত্র গানের মধ্য দিয়ে জানায় সে বাণিজ্যেতে যাবেই, লক্ষ্মীদের হারালেও অলক্ষ্মী হয়তো জুটে যাবে। তার ভাষায়—

''সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন পুরীতে যাব দিয়ে কোন সাগরে পাড়ি।"

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। সপ্তগ্রামে অতীত বাণিজ্য গৌরব সবার জানা। ষোড়শ শতকে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যে লিখেছেন

''এইসব শহরে যত সৈদাগার বৈসে।
কত ডিঙ্গা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে।।
সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।"

পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামের নাম দিয়েছিল— 'পোর্ট পিকানো' অর্থাৎ ছোট স্বর্গ, আর চট্টগ্রাম হচ্ছে - 'পোর্ট - গ্রান্ডী' অর্থাৎ বড় স্বর্গ।

অনেককাল আগে থেকেই এদেশে দু'ধরনের নৌকা চলিত ছিল। দেশের ভেতরে নদীপথে চলত যারা তাদের বলা হত - 'সামান্য', আর সমুদ্র পথে যারা চলত তাদের বলা হত 'বিশেষ'। রাজেন্দ্রলাল আচার্য লিখেছেন :

''কোন কোন যানের ৪টি পর্য্যন্ত গুণবৃক্ষ থাকিত। গুণবৃক্ষের সংখ্যানুসারে যানগুলিও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইত। পোত নির্মানোপযোগী কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিভাগে বিভক্ত ছিল। এই সকল পোত যে কেবল বাণিজ্য ভাণ্ডার বহন করিয়াই গমনামমন করিত তাহা নহে, কখনও আক্রমণে কখনও বা আত্মরক্ষায় কখনও আবার জলযুদ্ধের অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পোতাচালকগণ অশেষ গৌরব লাভ করিত।" (বাঙ্গালীর বল) বাংলার নৌশিল্পের প্রসারের অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি বর্ণনা করেছেন - বাংলার বেগবতী নদীর প্রাধান্যকে :

'বেগবতী নদীর প্রবাহ, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের লীলারঙ্গ বাঙ্গালীকে নৌবল দৃপ্ত কবিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপনিবেশ স্থাপনাকাঙ্খা বাণিজ্য লাভের ইচ্ছা তাহাকে সমুদ্রপথ যাত্রী করিয়াছিল।"

সপ্তগ্রাম (চরিত্রপুর), সুবর্ণগ্রাম (পূর্ববঙ্গ) তাম্রলিপ্ত এককালে বাংলার বাণিজ্যনগরী হিসাবে খ্যাত ছিল। ইসলাম খাঁর বাংলার নৌশক্তিকে প্রথম সংহত রূপ দেন। বছরে ১৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় ও মগগণ পাঁচ বছরে ১৩৩৫ খানি রণতরী আসামে পাঠান। মীরজুমলাও চেয়েছিলেন বাংলার নৌশক্তিকে সংস্কার করতে। শায়েস্তা খাঁ বাংলার নবাব হয়ে (১৬৬৫ খ্রিঃ) বাংলার নৌশক্তিকে সংহত করার জন্য পাইক পাঠিয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে রণতরী (অর্ণবপোত) নির্মাণ উপযোগী কাঠ সংগ্রহ করেছিলেন। এই কাঠ এসেছিল হুগলি, বালেশ্বর, চীলমারি, যশোর, খড়িবাড়ি, মুরং প্রভৃতি স্থান থেকে। ১৭ শতকে তৎকালীন নবাব ইসলাম খাঁ মেঘনা নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত ফেণী নদী পর্যন্ত অঞ্চল আরাকানী - মগদস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু - চট্টগ্রাম - ঢাকা - বাখরগঞ্জের বিস্তৃত এলাকা - মগ ও পর্তুগীজ মিলিত লুঠেরা, দস্যুশক্তির হাত থেকে মুক্ত করেন শায়েস্তা খাঁ। তিনি ২৮৮টি রণতরী নিয়ে যুদ্ধে নামেন। প্রথমদিনের যুদ্ধে ৪টি 'জালিয়া' তরণী এবং ১০টি 'ঘুরব' ব্যবহার করেন। মগ ও পর্তুগীজদের বড় বড় রণতরী (খালু ও ধুম) ছিল।

কর্ণফুলীর যুদ্ধে সায়েস্তা খাঁ বড় বড় রণতরীগুলিকে সামনে এবং চো দ্রুতগামী ডিঙিগুলোকে পিছনে রেখে মগ ও পর্তুগীজদের আক্রমণ করে। তাদের রণসজ্জা দেখে মগ, পর্তুগীজগণ পলায়ন করে (মগ - ধাওনি)। মোঘলদের কামানে কতগুলি নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ১৩৫টি রণতরী শায়েস্তা খাঁর সেনাবাহিনী পাকড়াও করল। এরপর চট্টগ্রাম দুর্গ অধিকার করা হলো। কতক মগদস্যু ভয়ে নৌকা যোগে পালিয়ে গেল। কিছু গ্রেপ্তার করা হল। সেনাধক্ষ্য উমেদ খাঁ এর বিজয়কে স্মরণে রাখতে চট্টগ্রামের নাম বদল করে রাখেন ইসলামাবাদ।

১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রণতরী মালদ্বীপ আক্রমণ করেছিল। ১৯৫৭ - ৫৮ সাল নাগাদ দেখা যায় ঢাকার হিন্দু শিল্পীগণ সুদৃঢ় জাহাজ নির্মাণ করতেন। ওয়াল্টার হ্যামিল্টন জানিয়েছেন বাংলার বারো ভুঁইয়ার প্রতাপ যখন তুঙ্গে তখন পূর্ববঙ্গের খিজিপুর, বন্দর, শ্রীপুর, ধাপা প্রভৃতি অঞ্চলে জাহাজ তৈরি হতো। Boltas তার Considerations on Indian Affairs' P-21 গ্রন্থে (১৭৭২ ক্রিঃ) জানিয়েছেন বাংলার বাণিজ্যতরী সমুদ্রপথে নানাস্থানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করত।

হাওড়া ডিস্ট্রেক্ট গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, সরকারের মিলিটারি স্ক্রেটারি রবার্ট কিডের চেষ্টায় ১৭৮৭ সালে বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন করে সেখানে সমুদ্রতরী নির্মাণপক্ষ সেগুণ গাছের চাষাবাদ শুরু হয়। বিশপ হেবার (১৮২৩ সালে) হাওড়ার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন—

''ইহা প্রধানত : পোত নির্মাণক্ষণ ব্যক্তিদিগেরই আবাসস্থল। ইহার ২৫ বৎসর পরও হাবড়ার লোক পোত - নির্মাণ কুশলী বলিয়া পরিচতি ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও হাবড়ার নৌশিল্প অনেকাংশে উন্নত ছিল।"

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে লিখেছিলেন কলকাতা বন্দরে ১০,০০০ টনের যেসব জাহাজ ছিল সেগুলো এদেশে তৈরি।

এগুলো বোম্বাইয়ের সেগুন কাঠের তৈরি জাহাজ কিংবা বিলাতে তৈরি ওক কাঠের জাহাজ থেকে অনেকাংশে ভাল।

একসময়ে চট্টগ্রামে জাহাজ তৈরি হতো। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পর এর অবনতি হয়। ১৯৬১ সালে এই বন্দরে ১৬ খানি জাহাজ তৈরি হতো। ১৮৭১ সালে তা কমে ৬এ এসে দাঁড়ায়। ১৮৭৪-তে আরো কমে ৩-এ। এরপর বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা ১৩২৫ সাল নাগাদ এখানে আবার জাহাজ তৈরি হতে শুরু করলেও বেশিদিন তা চলেনি। বাংলার বাইরে - মাদ্রাজ, শ্রীলঙ্কা, বর্মা, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে আমাদের কোস্টাল ট্রেড বা উপকূল বাণিজ্য চলত। চট্টগ্রামে একটি স্বদেশী কোম্পানি ছিল তারা রেঙ্গুনে জাহাজ চালাত। শেষ পর্যন্ত তারা 'সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি'র অধীনে চলে যায়।

বাংলার নদীপথ যেভাবে অবাঙালি, বিদেশীদের হাতে চলে গিয়েছিল তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ''বাংলার নদীপথে যেসব স্টীমার ও নৌকা চলে তাহা গবর্মেন্টের নয়। নৌকার মালিক দেশীয় লোক - বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বহু হিন্দুস্থানী এই কাজ করিতেছে। এক হিসাবে ইহাও এই শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া ব্যবসা। তবে স্টীমার কোম্পানিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী পুঁজিওয়ালার সম্পত্তি ও বাংলার নদীপথ ওসমুদ্র - উপকূল তাদের জমিদার বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর কোন সভ্য স্বাধীন দেশের আভ্যন্তরীন নদীবক্ষে বা উপকূলে বিজাতীয় কোম্পানির জাহাজ চলিতে দেওয়া হয়না। কিন্তু বাংলাদেশের বিদেশী স্টীমার কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অনেক দেশী জাহাজ কোম্পানি দেউলিয়া হইয়াছে। মাশুল ওভাড়া সম্বন্ধে তাহারা যথেচ্ছাচারী এবং ভাড়া কমাইয়া দেশীয়দের একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দিতা করিবার চেষ্টাকে সমূলে নষ্ট করিতেছে।' (বঙ্গ পরিচয়/ ২য় খণ্ড)।

একদা বাংলার নৌশিল্প উন্নতি লাভের পিছনে বাংলার নদনদী-খালবিলের প্রাচুর্যকেই মূল কারণ বলা যায়। আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অর্ণবপোত, দেশীয় নৌকা, নৌকা, নৌকারিগর সব মিলিয়ে নদীমাতৃক বাংলার অতীত ঐশ্বর্য ভোলবার নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন—

''বাংলার নৌবাণিজ্য তখন কোষ, বালাম, সোদপুরী প্রভৃতি নানা প্রকারের দেশী নৌকাযোগে হইত। যাত্রীবাহী নৌকা স্বতন্ত্র রকমের ছিল। বজরাতে বড় লোকেরা যাইতেন, সাধারণ লোকে 'পান্সী' 'তাপুরী' প্রভৃতিতে চড়িত। প্রত্যেক গ্রামেই এরূপ শত শত নৌকা থাকিত। বন্দর ও গঞ্জে ঘাটে নৌকার ভিড় লাগিয়া থাকিত এবং সে দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাইত। কলিকাতা হইতে গ্রামে এইসব নৌকাতে যাতায়াতের সময় বড় আনন্দ বোধ হইত। স্রোতের মুখে নৌকাগুলি তখন সারি বাঁধিয়া দাঁড় টানিয়া যাইত অথবা উজানে পাল তুলিয়া ছুটিত, তখন বড়ই মনোহর দেখাইত। এখন এসব অতীতের কথা বলিলেই হয়। ব্রিটিশ কোম্পানি সমূহের স্টীমার বাংলার নদীপথ আক্রমণ করিয়া এই বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।'' (আত্মচরিত)

১৮ শতকের বাংলাদেশে - গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা দিয়ে গোটা বাংলাদেশকে ছেয়ে ছিল। নদীপথই ছিল পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। আলেকজাণ্ডার ডাও লিখছেন —''এখানে প্রতিটি গ্রামের জন্যে একটি খাল, প্রত্যেক পরগনায় নদী, সমস্ত দেশের জন্যে গঙ্গা যে বিভিন্ন ধারায় সাগরে পড়ে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে।''

দু'একটি অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্র গ্রীষ্মকালেও নদীপরিবহন চালু থাকত। আট মাইলের মধ্যে সাধারণত : নদীপথ পাওয়া যেত। বছরে এক কোটি লোকের খাদ্য ও লবণ পরিবহন করা হতো। একাজে যুক্ত থাকতেন ৩ লক্ষ মানুষ। শুধু নৌ পরিবহণে ৩০,০০০ হাজার লোক যুক্ত থাকতেন। বুকানন হ্যামিল্টন জানিয়েছে ১৯ শতকের প্রথম দিকে এর ১০ গুণ লোক নৌপরিবহনে যুক্ত ছিল। এছাড়া বছরে এক কোটি ষাট লক্ষ মূল্যের আমদানি - রপ্তানি বাণিজ্য হতো নদীপথে। এছাড়া দেশজ পণ্য - কৃষিজাত ফসল, মাছ ও অন্য ফসলও নদীপথে পরিবাহিত হতো। পূর্বে নদীপথে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত একটি নৌকায় গড়ে ৪০ মাইল যাওয়া যেত। অন্যসময় ৭০ মাইল যাওয়া যেত। অবশ্য ছোট খাল ও নদীগুলোতে অনেক সময় গুণ টেনে নৌকা নিয়ে যাওয়া হতো। বর্ষাকালে ঝড়বৃষ্টিতে নৌকার ক্ষতি হতো, পথে চোর ডাকাতের উপদ্রবও থাকত। মালদা থেকে কলকাতায় কাপড়ের বেল আনতে সময় থাকত ৪০-৫০ দিন। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি শহর নদীপথের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্ট্যাভো বিনাশ লিখছেন :

''নদীতীরের অসংখ্য শহর ও গঞ্জ : নয়ন মনোহর ধান খেতের মধ্য দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত। নদীগুলি দেখতে সুন্দর ও নৌপরিবহনের অত্যন্ত উপযোগী। কোনো কোনো নদী এত চওড়া ও গভীর যে এগুলি দিয়ে বড় জাহাজ স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে।''

তখনকার কতগুলি জলপথ এরকম ছিল—

১. কলকাতা - ঢাকা : জলঙ্গী হয়ে পদ্মা। এখান থেকে পাবনাহয়ে ইছামতী ধরে জাফরগঞ্জ। সেখান থেকে ধলেশ্বরী হয়ে ঢাকা। আবার ঢাকা থেকে গোয়ালপাড়া (আসাম) যেতে হলে লখিয়া ও পুরানো ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করতে হত। ঢাকা থেকে শ্রীহট্ট যেতে হলে - বুড়িগঙ্গা ছোট মেঘনা ও সুরমা নদী ধরে যেতে হত।

২. কলকাতা থেকে পাটনা : উত্তর দিকের এই দুটি জলপথ। একটি ভাগীরথী ও কোশী। সুতী পার হয়ে মুঙ্গের হয়ে পাটনা। অপরটি জলঙ্গী - নদীয়া হয়ে কোশী।

সুন্দরবনের নদীপথ দিয়ে উৎপন্ন ফসল লবণ ও কাঠ পরিবাহিত হত।[৪] এখানে দুটো পথ ছিল। দক্ষিণের সমুদ্রপথ ও বেলেঘাটা পথ। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবরণে পাই : ''এখান থেকে হবিগঞ্জের মধ্য দিয়ে জলঙ্গী পর্যন্ত নাব্য নদীপথ ছিল। সুন্দরবন থেকে নদীপথে ঢাকা যাওয়া যেত। হাজি গঞ্জের ( ফরিদপুর) কাছে নবাবগঞ্জ খাল দিয়ে খুব সহজে ঢাকা ও লখিপুর যাওয়া যেত। গোয়ালন্দের কাছে জাফরগঞ্জ খাল দিয়ে ঢাকা, লখিপুর ও চট্টগ্রাম যাওয়ার পথটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হত। সারা বছর এপথে নৌ চলাচল করত। কর্ণফুলি থেকে রাঙামাটি পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ নদীপথ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনে ব্যবহৃত হত। বরিশালের কাছে দুর্গাপুর খাল দিয়ে নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জের নৌ চলাচল করত। মেঘনার বাম তীরে নারায়ণ গঞ্জের একটু নীচে রাজবাড়িতে অনেক গুলি সুন্দর পোতাশ্রয় (Several Commodious harbours for boats) ছিল। ঢাকার নিকট বুড়িগঙ্গা সারাবছর এমনকি গরমের দিনে বড় বড় নৌকা বহন করত। মেঘনার শাখা পাঙ্খিয়া দিয়ে সারা বছর মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। মেঘনার অপর শাখা ছোট মেঘনা দিয়ে সবচেয়ে সোজা ও ছোটপথে দাউদকান্দি থেকে শ্রীহট্টে যাওয়া যেত।

যশোরের কপোতাক্ষ নদ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বড় বড় নৌকা যাতায়াত করার জলপথ ছিল। যশোর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বুড়াশিয়া নদী দিয়ে সারা বছর বড় বড় নৌকা চলাচল করত। উত্তরবঙ্গের তিস্তা, পুনর্ভবা, মহানন্দা ও ধরলো নদী এবং মানস ও গোঘাট খাল নৌপরিবহনের সহায়ক হত। তিস্তা নদী এসময়ে কোন কোন স্থানে খুবই সঙ্কীর্ণ ও অগভীর। গ্রীষ্মকালে তিস্তা দিয়ে নৌচলাচলে

অসুবিধা দেখা দিত। ঘোগাট খাল দিয়ে জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫০ মনী নৌকা স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারত। দিনাজপুর জেলায় যোগাযোগের নদী পুনর্ভবা। ধরলা নদী ৩৫০ গজ থেকে সিকি মাইল চওড়া এবং এ নদী দিয়ে সারা বছর দু'হাজার মণী নৌকা রংপুরের কুরিগ্রাম থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত চলাচল করত। বর্ষাকালে ধরলা পুনর্ভবার সঙ্গে যুক্ত হত। উত্তরবঙ্গে অন্যতম প্রধান নদী মহানন্দা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া ও মালদা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মহানন্দা ও জেলাগুলির যোগাযোগ ও পরিবহনের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত।" (বাংলার আর্থিক ইতিহাস)

এখানে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নদীগুলির পরিচয় আছে। ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের রেশমনগরী বন্দর কাশিমবাজার কিভাবে জনশূন্য নির্জন পুরী হয়েছে তা সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— 'বন্দর কাশিমবাজার' রচনায় দেখিয়েছেন।[৫] তেমনি শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্ত দঃ ২৪ পরগনার আদিগঙ্গার গতিপথ ও শাখা প্রশাখার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন— 'আদিগঙ্গা নদী' রচনায়।[৬]

আমরা এতক্ষণ ধরে বাংলার নদীপথের কিয়ৎ বিবরণ দিলাম। যেহেতু নদী আর নৌকা ছিল, নৌ-নির্মাণ শিল্পও ছিল। সরস্বতী নদীর জীবৎকালে বন্দর সপ্তগ্রামের বৈভব ছিল। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখছেন—"সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যের সর্বপ্রধান বন্দর ছিল। এখানে সকল দেশের নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি পরিজ্ঞাত ছিল; সকল দেশীয় লোকেরা এখানে আসিয়া আবশ্যক মত নৌকা নির্মাণ বা সংস্কার করিয়া লইত।' (যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড) বলাগড়ের নৌশিল্পের খবর আমাদের সকলের জানা। এখানকার শ্রীপুরের নৌশিল্প সারা দেশে বিখ্যাত ছিল।[৭] কোন্নগরেও অর্ণবপোত নির্মিত হত। সতীশ মিত্র আরো লিখছেন— "...প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোহরের কারিগরগণ জাহাজ নির্মাণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" শ্রদ্ধেয় তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছিলেন— "চট্টগ্রাম এখনও প্রাচীন প্রথায় সমুদ্রগামী পোতসমূহ দেশীয় প্রথায় নির্মিত হইয়া থাকে।" (বঙ্গবাণী/মাঘ, ১৩৩৩)

অতীতে— 'গৌড়ে 'লাঘাটা' ও চিড়াই বাড়ি' নৌকা নির্মাণের স্থান ছিল। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে ঐরূপ নির্দিষ্টস্থান এখনও আছে। চট্টগ্রামের হিন্দুমুসলমান শিল্পীর অধীনে বহু সূত্রধর পোত নির্মাণে নিযুক্ত থাকত।" (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগে বাংলা) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন বাংলার নৌশিল্প..."বীরভূমের বুহিতাল এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল।" (জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য) সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় বেভারিজ প্রণীত বাখরগঞ্জ (১৮৭৬) গ্রন্থে। এ জেলার নদী ও নৌশিল্পের বিস্তৃত বিবরণ: "এই জেলায় নৌকা নির্মাণ একটি চমৎকার শিল্প। মেদিগঞ্জ থানা এলাকায় দেবাইখালি ও শ্যামপুর গ্রামে উৎকৃষ্ট 'কোষ' নৌকা তৈরি হয়। আগরপুরের নিকট ঘন্টেশ্বরে এবং পিরোজপুর থানার এলাকায় বর্ষাকাটী গ্রামে ভাল পানসী নৌকা তৈরি হয়। শেষোক্ত স্থানে উৎকৃষ্ট মালবাহী নৌকাও তৈরি হয়। সুন্দরবনে মগেরা কেরুয়া গাছের গুড়ি হইতে ডিঙি তৈরি করে; শুঁদরী কাঠের ডিঙি সর্বত্রই হয়; ঝালকাঠী, কালিগঞ্জ, বাখরগঞ্জ, ফলাগণ প্রভৃতি স্থানও নৌকা তৈরির জন্য বিখ্যাত।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখছেন— "এই রূপে নৌকা তৈরির কাজ করিয়া বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করিত।" —বলা যায় নদী নালা খালবিল জলা জংলা দেশের প্রতিটি অঞ্চলেই ছোট বড় নৌ-কারিগর ছিল। নৌকা মেরামত ও নির্মাণ কৌশল যেন তাদের জীবনের অঙ্গীভূত। পূর্ব-বঙ্গের নদী জীবনের ঐতিহাসিক চিত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কলমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে : "পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় নদীতেই ডাক স্টীমার চলে, সুন্দরবন ও আসাম ডেসপ্যাচ ডাক, যাত্রী ও মাল প্রভৃতি বহন করিয়া থাকে। অনেকস্থলে ইহার সঙ্গে রেলওয়ে সার্ভিসও আছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম বরিশাল হইতে নৌকা যোগে কলিকাতায় আসিতে হইলে প্রায় পনর দিন সময় লাগিত। মালবাহী নৌকায় আসিলে আরও বেশিদিন লাগিত। কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ২৪ ঘন্টায় ও ঢাকায় ১৪-১৫ ঘন্টায় যাওয়া যায়।" (আত্মচরিত)

কলকাতা থেকে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে স্টিমার যোগে যাতায়াতের অপূর্ব বিবরণ পাওয়া অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে' গ্রন্থে। জাহাজ ব্যবসার আদিপর্বে দ্বারকানাথ, রামদুলাল দে, রুস্তমজীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে স্টিমার পরিবহন ব্যবসায় নামেন। শেষপর্যন্ত বিদেসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটেন। আর হরেন্দ্রনাথ পালের নৌ ব্যবসায় একই পরিণাম ঘটে।[৮]

## ।। চার ।।

দীর্ঘক্ষণ ধরে নানান উদাহরণ, উদ্ধৃতি যোগে নদীমাতৃক বাংলার নদী জীবন, নৌসংস্কৃতির খানিক পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এখনে দেখা দরকার বাংলার নৌশিল্প কিভাবে ধ্বংস হলো। তার আগে দেখা দরকার নৌপরিবহন ও নৌশিল্পে কারা যুক্ত ছিল। স্পষ্টতই বোঝা যায় প্রান্তবাসী বা নিম্নবর্গীয় হিন্দু, মুসলামান -এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গে মুসলিম অধিকার আসার পূর্ব থেকেই নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা একাজে যুক্ত ছিলেন। অথবা বলা যায় নিম্নবর্গীয় হিন্দুর দল যারা ধর্মান্তরিত হয়ে নিম্নবর্গীয় মুসলমান হয়েছিলেন। নদী প্রকৃতি যাদের নৌজীবী, নৌশিল্পী হতে বাধ্য করেছিল। মহাভারতে নদী পারাণিয়া— কৈবর্ত রমণী মৎসগন্ধার কথা আছে। চর্যাপদে পাটনী নারীর কথা, শিবায়নে অন্ত্যজ ঈশ্বরী পাটনী। কিংবা 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'গঙ্গা' সব উপন্যাসে প্রান্তবাসী নদীজীবীদের কথা। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মত এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে— "অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষিকার্য ও তদবলম্বনে গুঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী আকারের বড় - বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় বড় নদী এমনকি সাগরও পার হইত।" তিনি আরো বলেন, আমাদের প্রধান নদনদীগুলির নাম অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। যেমন - গঙ্গা। তাঁর মতে— "...আর্যভাষা উত্তর ভারতে ও বাংলায় প্রসূত হইবার বা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, দেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল; অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষায় কথা দিয়াই দেশের নদ - নদী পাহাড় - পর্বত ও গ্রামের নামকরণ করিয়াছিল, সেই সকল নামকে কোথাও ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া উত্তর কালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত হইয়া, অর্থহীন নাম রূপে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। (যথা - অনার্য ভোট ব্রহ্ম ভাষার 'দিস্তাং' হইতে 'তিস্তা' ও 'ত্রিস্রোতা' কোল ভাষার 'কব - দাক' হইতে 'কপোতাক্ষ', 'দামু - দাক' হইতে দামোদর'...)—এখন হইতে আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরাই বাঙ্গালা দেশে বাস করিত, সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া তাহারা ছিল; দেশে তখন আর্যভাষা—স্থাপিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।" (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য)

## ।। পাঁচ ।।

নদী আর নৌকা একে অপরের পরিপূরক। নদী না বাঁচলে নৌকা বাঁচেনা। আর নৌকা না বাঁচলে নৌজীবীরা বাঁচার তাগিদে কৃষি

বা অন্য পেশা গ্রহণ করে। ফলে কৃষির উপর চাপ বাড়ে। কিন্তু নদনদী ধ্বংসের কারণ কী? এর পেছনে প্রাকৃতিক কারণ যেমন রয়েছে তেমনি আছে মনুষ্য সৃষ্ট কারণ। শৈলেন্দ্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নদীনালা ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধান করে লেখেন :

''খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুষ্ক পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার তাড়নায় এবং বিদেশী নাগরিকগণের গাত্রস্পর্শে আমরা বুঝিলাম বাংলাদেশের পল্লীজীবন নিতান্ত অসভ্যতার পরিচায়ক। সুতরাং অনতিবিলম্বে আমরা পাকাবাড়ি ও পাথুরিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে লাগিলাম এবং যে খাল ও নালার সাহায্যে নদীর ঘোলাজল দেশময় ছড়াইয়া পড়িত সেই পয়ঃপ্রণালীসমূহ আগেই যথাসম্ভব বন্ধ করিযা দিলাম। শ্রীঘ্রই রেলগাড়ির যুগ আসিয়া পড়িল; সেজন্য কৃষিক্ষেত্রে, বিল ও জলাভূমির উপর দিয়া বড় বড় বাঁধ প্রস্তুত করিতে হইল এবং নদী ও খালের বুক চাপিয়া যথাসম্ভব ছোট ছোট সেতু নির্মিত হইল। শহর, পাকা রাস্তা ও রেলপথকে বন্যার জলের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রবল 'পাহাড়িয়া' নদীগুলির পার্শ্বে অছিদ্র সুবৃহৎ বাঁধ দেওয়া হইল। অধিকন্তু প্রলম্বিত রেল ও রাজপথ বিস্তারের পক্ষে যাহাতে শাখা - নদীগুলি অন্তরায় হইতে না পারে সেজন্য ইহাদের শিরঃচ্ছেদ করিযা ক্রমশ : মূল নদীর সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইল।

...পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বাণিজ্যের স্বার্থে সুজলা বঙ্গদেশকে কিরূপ মরুভূমিপ্রায় করা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত - স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দামোদর নদের সন্নিকটস্থ বর্ধমান শহর হইতে মেঘনানদের তীরবর্তী চাঁদপুর বন্দর পর্যন্ত (৯০ ক্রোশ মাত্র) কেহ বায়ুযানে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মধ্যবর্তী প্রদেশে কেবল ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা—চূর্ণী, ইছামতী ও মধুমতী এই চারটি নদী এখনও স্রোতস্বতী; কিন্তু বাঁকা, গাঙ্গুর, বেহুলা, ধুসী, কোদালিয়া, বেদনা, কপোতাক্ষ, ভৈরব, চিত্রা বৃহদায়তন শাখানদী শুষ্ক প্রায়; এই সেই কারণে বর্ধমান, নদীয়া, যশোরও ফরিদপুর জেলার অনেকাংশ তেজহীন ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য এই দ্বাদশ নদীই মনুষ্যকৃত উৎপাতে এখানে প্রবাহহীন।...

কেহ কেহ মনে করেন বাংলাদেশের অনেক নদী মরিয়া গিয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুতপক্ষে অবহেলা প্রযুক্তি বা কৌশলক্রমে আমরাই অনেক নদীকে মারিয়া ফেলিতেছি। নদীর উৎপত্তি - স্থানে বা গর্ভে বা মোহনায় বা একাধিকস্থানে বাঁধাল ও অন্যান্য রূপ অবরোধ দেওয়ার ফলে নদীতে জলপ্রবাহ বন্ধ বা হ্রাস হইয়া নদী ক্রমশ: ভরাট হইয়া আসিতেছে। ছোট সেতু ও অপরিসর সাঁকোর প্রভাবে নদীনালার যে কি সর্বনাশ করা হয় তাহা কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ অনেক সময় উপলব্ধি করেন না। নদীর গর্ভে পোস্তা বাঁধিলে বা নদীর পার্শ্বে লম্বা বাঁধ দিলে নদীর ক্ষতি হয় ইহা সকলেই জানে, কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করেন কয়েকজন?'' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৯)

নদী বিপর্যয়ের ফলে বাংলার অন্যতম বন্দর— তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম ও কাশিমবাজার ধ্বংস হয়ে গেল।[১] আর এদেশ থেকে সেগুন কাঠ লুণ্ঠনের ফলে এদেশে জাহাজ নির্মাণ বন্ধ হবার যোগাড় হল। ইংরেজদের 'ওক' কাঠে নির্মিত জাহাজ অপেক্ষা আমাদের 'সেগুন' কাঠের জাহাজ যে অনেক শ্রেয় তা সেকালের ইংলন্ডের জাহাজ ব্যবসায়ীরা বুঝেছিলেন।

আমাদের মূল নদী - নদী পথে সমান্তরালে ইংরাজরা রেললাইন বসিয়েছিল। এদেশের জলপথের অধিকার তারা নেয় প্রথমে তারপর স্থলপথের প্রসার ঘটায়। উদাহরণ হিসাবে ফরিদপুর জেলার কথা বলা যায়। এই জেলার ১৯২৫ সাল নাগাদ পদ্মা, মেঘনা, মধুমতী ইত্যাদি বড় বড় নদীতে ও জেলার ভেতরে অনেক স্টিমার চলাচল করত। ও. ম্যালির গেজেট থেকে জানা যায় নিম্নবর্গীয় প্রায় ৪৭ হাজার মানুষ মাছ ধরে, বিক্রয় করে জীবিকা চালাত তা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়। ''পূর্বে নদীতে মাল ও যাত্রী বহনের জন্য যেসব বড় বড় নৌকা চলত, বিদেশী কোম্পানির জাহাজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যেসব তাঁতি, জোলা ও মাঝি মাল্লাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওযা হইয়াছে, তাহারা সকলে এখন কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ বাড়িয়াছে।'' (আত্মচরিত/ প্রফুল্লচন্দ্র রায়/ ১৯৩৭)

সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর 'দেশের কথা' গ্রন্থে' রেল ও খাল' নামক প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে আমাদের নৌশিল্প ও নদীপথ ধ্বংস কবে ইংরাজ এদেশ থেকে সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য রেলপথের দ্রুত বিস্তার ঘটিয়েছিল। এখানে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে :

(ক) রেলপথের বিস্তার

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ ৫৬৭৯ মাইল ছিল।
১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ ৯১৬৭ মাইল ছিল।
১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ ১২৩৮৫ মাইল ছিল
১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ ১৬৯৮৪ মাইল ছিল।
১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ ১৯৭১৮ মাইল ছিল।
১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ ২৩৭৮০ মাইল ছিল।
১৯০০ খ্রিস্টাব্দ ২৬৪৭৪ মাইল ছিল।

(খ) নৌশিল্পের অবস্থা

| সাল | নৌসংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৫৭ | ৩৪,২৮৬ |
| ১৮৯৯ | ২,৩০২ |
| ১৯৫০ | ১,৬৭৬ |
| ১৯০১ | ১০৪৯ |

ওই দীর্ঘ রচনায় তিনি আরো কতগুলি পরিসংখ্যান দিয়েছেন। যেমন, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে এদেশে ৪৫৮ কোটি টাকার রেলপথ নির্মাণের সরঞ্জাম এসেছে। এই টাকা ওদেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের হাতে গেছে। রেলপথ বিস্তারের জন্য ইংরাজ এদেশীয় প্রজাদের —৩৫৫০৪৭০০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। আজ জলপথের পরিচর্যায় ৩৮ কোটিরও কম টাকা ব্যয় করেছেন। তাঁর মতে— ''আমাদের ব্যবসায়ে ইংরাজ ধনী, সুতরাং লভ্যাংশ সমস্তই তাঁহাদের। দেশে রেলপথ বিস্তারের সহিত

ভারতীয় বাণিজ্যের যতই বিস্তার হইতেছে, ততই ইংরাজের ধন বাড়িতেছে, আর আমরা ক্রমেই ধনহীন হইতেছি। রেলপথে এদেশের ধন হরণের একটি প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়াছে।

এইসকল কারণে ভারতবাসী দেশে রেলের বিস্তার অপেক্ষা খালবিলের সমধিক বিস্তার অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে।" (রেল ও খাল/ সখারাম গণেশ দেউস্কর)

১৩৪২ সালের চৈত্র সংখ্যায় মাসিক বসুমতী পত্রিকায় 'বাঙ্গালার নদীপথ' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত রচনায় বাংলার নদীপথ মজে যাওয়া ও জ্বর (Damodar Fever) সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তার অংশবিশেষ—"বাঙ্গলার নদীপথের কথা আমরা ইতঃপূর্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। এই নদীপথগুলি হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার যে ঘোর সর্বনাশ হইয়াছে—বাঙ্গালা স্বাস্থ্যহীন ও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস যাঁহার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। পূর্বে জমিদারগণ নদী রক্ষা করিতেন, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশের মালিক হইয়াছিলেন, তখন নদী রক্ষার দিকে তাঁহাদেরও দৃষ্টি না পড়াতে, নদীগুলি সমস্ত হাজিযা মজিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই স্বাস্থ্য-সম্পদ-সম্পন্ন দেশটি স্বাস্থ্যহীন প্রেতপুরীতে পরিণত হইয়াছে। সরকার কর্তৃক পণ্যবাহী রাজপথ এবং রেলপথ প্রস্তুতকালে দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইল কিনা তাহা না দেখায় আজ বাঙ্গালার এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। জ্বর কমিশনের অন্যতম সদস্য স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় একাকীই বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহীনতার এই কারণটি দৃঢ়তার সহিত নির্দেশ করিয়াছিলেন। ঐ কমিশনের অন্যান্য সদস্য ইংরেজ ছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধিতে কিন্তু সে সিদ্ধান্তটি যোগায় নাই। যাহা হউক, সত্য কখনও চাপা থাকে না, জ্বর - কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন তাহা বিংশ শতাব্দীর প্রায় একপদে গত হইলে সরকারি ডাক্তার বেন্টলী এবং নিশরের সেচ বিভাগের বিশেষজ্ঞ সার উইলিয়ম উইলকক্স মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সরকারের এই অনবধানতার ফলে দেশের জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে মধ্যবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ জনপদ বিধ্বংসী ম্যালেরিয়া ব্যাধিতে ভরিয়া গিয়াছে।...

...সেই জন্য আমাদের মতে এই জ্বরোৎপত্তির কারণ উচ্ছিন্ন করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। বাঙ্গালার হাজা মজা নদীগুলির সংস্কার সাধন করা সেই জন্য একান্ত আবশ্যক। সেদিন ব্যবস্থার পরিষদে এই হাজামজা নদীগুলির সংস্কার সাধনের কথা উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু সেচ বিভাগের অস্থায়ী ন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন বলেন— 'সরকার যাহাতে সেচবিভাগের প্রবাব মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালার জলপথের সংস্কার সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য একটি Water Ways Board বা জলপথ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন এবং জলপথ আইনও বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু কার্য্যেবিশেষ প্রয়োজন বুঝিলেও সরকার অর্থাভাবে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।' সরকার এই কার্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বুঝিলেও ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। দেশের প্রয়োজন সাধক কার্য্যে এরূপ অর্থাভাবের অজুহাত নিতান্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক। নদীপথ - সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইবার ফলে জলপথ সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এখন যদি তদনুসারে কার্য্য করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এই বিষয়ে অর্থব্যয় করিয়া কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন কি ছিল?"

।। ছয়।।

## বাংলার নৌ-শিল্পের কফিনে শেষ পেরেক

১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুর জাপান দ্বারা অধিকৃত হলে এদেশের সাহেব কর্তারা ধরে নিয়েছিলেন অচিরেই জাপানীরা আসাম ও বাংলাকে আক্রমণ করবে। সুতরাং তৎকালীন লীগ মন্ত্রীসভায় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই তৎকালীন গভর্ণর স্যার হার্বার্ট নির্দেশ দিলেন সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে যতদ্রুত নৌকা, সাইকেল, হাতি অপসারণ করতে হবে। হুকুম জারির সঙ্গে সঙ্গে দারোগা, পুলিশ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা নাওয়া খাওয়া ভুলে একাজে নেমে পড়ে। সরকারি হিসাবে ২৬ হাজার আর বেসরকারি মতে ৪০ হাজারের বেশি নৌকা মাঝিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি ধান ভর্তি নৌকা থেকে ধান নামিয়ে নৌকা নেওয়া হয়। মানুষের চোখের সামনেই ধান নষ্ট হয়েছ অথচ উপায় নেই। এর মধ্যে ৯৪৩৫টি নৌকাকে জ্বালানি কাঠ হিসাবে বিক্রি করা হয়েছিল। কিছু নৌকাকে নিরাপদে রাখার নামে প্রহসন করা হয়। শেষপর্যন্ত সেগুলি আর ব্যবহারযোগ্য ছিল না। অল্প কিছু ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেসময় নৌকা, সাইকেল, চাউল অপসারণের নামে 'ডিনায়েল পলিসি' চলেছিল তাতে কোটি কোটি টাকা তছনছ হয়। ১ কোটি ২২ লাখ টাকার হিসেব পাওয়া যায়নি।[১০] এই নৌকা ধ্বংসের ফলে নদীমাতৃক অঞ্চলের লাখ লাখ গরীব মানুষ যারা মুসলমান ও তপশীলী সম্প্রদায়ের তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সেসময় মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য অঞ্চল সহ তমলুককেও বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়। সেকানকার নৌকা অপসারণ বিষয়ে প্রবাসী, পৌষ, ১৩৫২ লিখেছে : "১৯৪২ সালের ৮ই এপ্রিল একটি আদেশ আসিল। দায়িত্বহীন কর্তপক্ষ সকল শ্রেণির নৌকা সরাইয়া ফেলিতে চাইলেন, পাছে জাপানীরা ঐগুলি ব্যবহার করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন, সমগ্র কাঁথি মহকুমা এবং তমলুক মহকুমায় নদীগ্রাম ও ময়না থানা এলাকা হইতে সবরকম নৌকা ৩ ঘন্টার মধ্যে সরাইয়া ফেলিতে হইবে, নৌকাগুলি ৩০ হইতে ৯০ মাইল দূরে নেওযার আদেশ হইল। এই অসম্ভব আদেশ পালন করা অসাধ্য। ইহাতে শুধু দুর্নীতি পরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের ঘুষের দরজা খুলে গেল। শত শত নৌকা পুড়াইয়া ফেলা হইল, নষ্ট করা হইল। অসংখ্য লোক জীবিকার একমাত্র উপায় পেতে বঞ্চিত হইল। বাংলা গবর্মেন্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু সেখানে গিয়া সরকারি নীতির সমর্থন করিলেন এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিনে। এই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হওয়া দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামমাত্র হইয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মোটেও দেওয়া হয় নাই।" বলা বাহুল্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নামে প্রহসন হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যে পেয়েছে। সরকারি কর্মচারীরা অসহায় গ্রামবাসীদের অল্প টাকা দিয়ে বেশি টাকার রসিদ লিখিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে সরকারি ধার্য টাকা অত্যন্ত কম ছিল। সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচার , অনাচার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মন্ত্রীসভা থেকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। কিন্তু অন্য দুই মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসু ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেননি। তৎকালীন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা নৌ - অপসারণের ভবিতব্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। এরপরে আসে ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ - এতে মারা যায় অধিকাংশ জলজীবী নৌজীবী ও নদীমাতৃক-নৌ নির্ভর অঞ্চলের ৫০ লক্ষ মানুষ। যদি সময়মত খাদ্য সরবরাহ করে জলপথে নৌ মারফৎ বিলিবন্টন করা হত তাহলে এ দশা হতো না। এরপর লীগ মন্ত্রীসভায় এইনিয়ে গোলমাল দেখা দেয়, ভাঙ্গন ঘটে। ফলে সরকার ও লীগমন্ত্রীসভা তড়িঘড়ি সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নিল যে, অচিরেই নতুন নৌকার ব্যবস্থা করা হবে এবং বাংলার নৌপথ আগের মত কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে কিন্তু বাস্তবে যা হলো তা ভয়ঙ্কর। নয়া নৌ-নির্মাণের নামে

চূড়ান্ত প্রহসন শুরু হল।

এরপর নূতন নৌকা তৈরির পালা। ১৯৪৪ সালে আড়াই কোটি এবং ১৯৪৫ সালে ৫ কোটি টাকা বাজেটে নতুন নৌকা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হল। একাজের ডিরেক্টর হলেন দুইজন 'ভাগ্যান্বেষী' ইউরোপীয়। একজন চেক/ ইহুদী অপরজন হাঙ্গেরিয়ান ইহুদী। হাঙ্গেরিয়ান ইহুদীটির নাম আলেকজান্ডার কোভাক্স। ইনি আগে এক মাড়োয়ারীর অধীনে কাজ করতেন। কান্ট্রিক্রাফটস্ সম্বন্ধে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। নৌশিল্প সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই কোভাক্সের বন্ধুটির নাম হারমান। তাকে 'চীফ ইন্সপেক্টর অব বোটস করা হয়। ইনি আগে ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে 'প্লাইউড' বিভাগে চাকরি করতেন। পরে, চাকরি নেন রুংটা এ্যান্ড সন্স কোম্পানিতে' মাসিক ৮০০ টাকার চাকরি। মাসিক ২০০০ টাকা বেতন দিয়ে তাকে কোবাক্স উক্ত পদে বসান।

নৌ নির্মাণে সরকারি বরাদ্দকৃত ৬ কোটির অধিক টাকা দুভাগে ভাগ করা হয়। একভাগ মন্ত্রী সাহাবুদ্দিনের দপ্তর পায় অপরভাগ সিভিল সাপ্লাইয়ের কর্মদার মেজর জেনারেলের ওয়েকলির হাতে দেওয়া হয়। সাহাবুদ্দিনের বিভাগে নৌ - নির্মাণের ঠিকা দেওয়া (Boat Building Contract) দায়িত্ব পেলেন তাঁর অনুগত মুসলিম লিগের নেতা শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র। দেখা গেল নৌকা নির্মাণের কাঠ আসছে সাহাবুদ্দিনের জঙ্গল থেকে। তাঁর শ্যালক সমিল সাহেবও এ ব্যাপারে ছড়ি ঘোরাতে লাগলেন। অপরদিকে কোভাস্ক, হারম্যানের বদান্যতায় নৌ - নির্মাণের ঠিকা পেল, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী ঠিকদার। রুংটা, রিজেন্ট স্টেটও জড়িয়ে পড়ল। একজন মাড়োয়ারি ঠিকাদার তো বেনামে ১০ দফা ঠিকা পেলেন । ঠিকা দেবার সময় শর্ত ছিল অন্তত: দুবছরের পোক্ত শাল কাঠ দিয়ে নৌকাগুলো বানাতে হবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল— আম - আসনাই প্রভৃতি বাজে কাঠের, কাঁচা কাঠের চালাই দিয়ে নির্মাণ করা হলো। দেশীয় মুসলিম ও নিম্নবর্গীয় কাহিগর নৌ-নির্মাণে যারা দক্ষ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞ তাদের কাজে নেওয়া হল না। ঠিকাদাররা অধিক মুনাফার লোভে নৌকার গঠনেও হেরফের করলেন। ১০০ মনের নৌকা বাস্তবে ৭৫ মনের বেশি মাল বইতে পারল না। আয়তনে কমতি, বাজে গড়ন, কাঁটা কাঠ, অদক্ষ মিস্ত্রী, কারিগর সব মিলিয়ে কেলেঙ্কারির শেষ নেই। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার— ঠিকায় বড় বড় নৌকা নির্মাণের খরচ ধরা হয়েছিল ৬০০০ টাকা এবং ২০০০ মণ মাল বইতে পারে এমন ছোটকাটো জাহাজের দাম ২৩০০০ টাকা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বাজেয়াপ্ত করার সময় অনেক মেছো নৌকা, বা খেয়াবোটের ছোট নৌকাও নেওয়া হয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র বড় নৌকা তৈরির জন্য কেন কন্ট্রাক্ট দেওয়া হল? তখন কর্তারা যুক্তি দিলেন, প্রয়োজনে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের চাল বহন করে যাতে দুর্ভিক্ষ বিনারণ করা যায়, সেজন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু ওই বিভাগের ঠিকাদাররা অভিযোগ করেন— তাদের বড় বড় নৌকা কাজের অভাবে বসে আছে। এমনকি অনেক নৌকা কর্তারা ভাড়া নিয়ে শুধু শুধু বসিয়ে রেখেছেন।

বলাবাহুল্য নিম্নবর্গীয়, হিন্দু মুসলমান, জেলে, মাঝি, নৌ-কারিগর সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হল তারা নৌকা চালিয়ে, মাছ ধরে বা নৌকা গড়ে কোনোভাবে কিছু সংস্থান করতে পারল না। অপরদিকে নৌকার এই অনুপস্থিতির সুযোগ— রেল ও স্টিমারের এত ভিড় হল যে তাদের লাভের চূড়ান্ত হল।[১১]

প্রথমে ১২ হাজার নৌকা তৈরি শুরু হল। অচিরে আরো নৌকা তৈরি হবে সরকারি ঘোষণায় বলা হল। কিছুদিনের মধ্যেই করিৎকর্মা ঠিকাদাররা নৌকা তৈরি করেও ফেলল। কিন্তু সে নৌকা কলঙ্গিত দেহ নিয়ে জলে ভাসে না। ডুবে যাওয়ায় ভয়ে সে নৌকা কেউ ব্যবহার করতে চায় না। ফলে দেশীয় নৌশিল্পীদের দ্বারা সেগুলো মেরামত করে পোর্ট কমিশনারের সার্ভেয়ারের পরীক্ষার পর বোট সাপ্লাইড ডিপার্টমেন্ট সেগুলোকে নিলাম ঘোষণা করল। কিছু নিলাম হল বটে কিন্তু বেশিরভাগ পড়ে পড়ে নষ্ট হল।

এইভাবে নৌকা নির্মাণের নামে লীগ—মন্ত্রীসভার একদল কর্মকর্তার নৌবিলাস ও অর্থ অপচয়[১২] আসলে বাংলার নৌজীবী ও নৌশিল্পের উপর বড় আঘাত। যদি ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকাটা সরাসরি, মৎস্যজীবী, নৌজীবীদের হাতে দেওয়া হত তাহলে দেশীয় কারিগররা উপকৃত হতো। অথবা যদি ছোট নৌকা, জেলে ডিঙি, খেয়া নৌকা তৈরি করা হত তাহলে গ্রামবাংলারই উপকার হতো। কিংবা যদি নৌ নির্মাণের দেশীয় কারিগরকে নেওয়া হতো নৌনির্মাণে তা হলেও কিছুটা মঙ্গল হতো।

এইভাবে বাংলার নৌশিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হল। নৌকার অভাবে আমরা ১৩৫০ এর মন্বন্তরের দিনেও সহজে নদীবহুল অঞ্চলে পণ্য পৌঁছাতে পারিনি। এমনিতেই নৌকার অভাবে নৌজীবীরা মৃত ছিল, মন্বন্তর এসে পুরোপুরি মেরে ফেলল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নদীপথের উন্নতি নিয়ে আরও একপ্রস্থ রসিকতা হয়।[১৩]

## ।। সাত।।

এক সময় আমাদের চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত দেশীয় রণতরী মেলা দেখতে দেশ বিদেশ থেকে সম্রাট সুলতানের প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছিলেন। দেশীয় সূত্রধর ও কারিগরদের সৃজন প্রতিভা তাদের চমৎকৃত করেছিল। নৌনির্মাণ উপযোগী শক্তপোক্ত শাল, পিয়াল, জারুল, সেগুন কাঠ শুধু নয় গাম্ভীরী, তমাল, কাঁঠালও সহজলভ্য ছিল গ্রামবাংলায়। আর নৌকার কি সব কাব্যিক নাম-মণপবন, মধুকর, ময়ূরপঙ্খী, সাগরফেনা, বালাম, সাম্পান আরো কত কী! এমনকি নৌকার সামনের দিকে ও মুখে সাপ, বাঘ, সিংহ, মকর, হস্তী, হংস, ভেক প্রভৃতি সাত প্রকার পশুপাখির অনুকৃতি লাগিয়ে দেওয়া হত। আর মাশুলের উপরে থাকতো চামরধ্বজ। ১৯৪৭ সালেও কলকাতা বন্দরে ৩৩০০ টি লোহা ও ২০০০টি কাঠের নৌকা কর্মরত দেখা গেছে। কিন্তু দেশভাগের পরে তা কমে আসে। বাংলার সাবলীল - বহমান প্রাকৃতিক দীর্ঘ জলপথে আঘাত আসে। আসলে মুশকিল হল প্রকৃতি তো রাজনীতি বোঝে না। সে স্বাধীন মতো চলতে চায়। উন্নয়নের নামে নদীতে সেতু, বাঁধ তাকে রুগ্ন করে। আমাদের উদাসীনতায় মাতলা নদী মরে গেল। বাকিগুলোও মরবে অচিরে। ভাগ্যিস নদীজীবনকে কেন্দ্র করে কতগুলো ধ্রুপদী, কাব্য - কবিতা, গীত, উপন্যাস, ভ্রমণ সাহিত্য রচিত হয়েছিল নইলে আজকের নদী সংস্কৃতির মৃতপ্রায় পটভূমিতে কী আর সৃষ্টি হতো অনাসৃষ্টি ছাড়া? প্রকৃতিকে আঘাত করা আসলে মূর্খ কালিদাসের মত আত্মঘাতী প্রক্রিয়া। আমরা কী আজও সচেতন হব না? আজ মনে পড়ছে কবির বহুল ব্যবহৃত সেই সতর্কবাণী— যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে...

আমরা কী নদীর স্রোতকে তার মত চলতে দিতে পারি না? আসুন না একটু সক্রিয় সদর্থক ভূমিকা নিই ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

---

**উল্লেখপঞ্জি :**

১। দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালায় মগ দৌরাত্মের বিবরণ। শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৫। এর ক্রমশ: হুগলি, হিজলি, তমলুক, ঢাকা, শ্রীপুর, চাক্‌লা প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে।

২। গ্রন্থটি ভোজরাজের নিজ লিখিত নয়। সম্ভবত : তিনি সংকলক। এ বিষয়ে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি— ''Yukti-Kalpataru Compilation by Bhoja Nara Pati.'' উরত গ্রন্থের নানা উদ্ধৃতি বিচার করতে তংার মনে হয়েছে গ্রন্থটি মগধ বা বঙ্গে রচিত।

৩। শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবনিকের পালা' দ্রষ্টব্য।

৪। দ্রষ্টব্য : 'পরায়ত্ত পরগণা কথা', মনোরঞ্জন রায়, ১ম খণ্ড ও 'আদিগঙ্গা নদী'। শ্রী কালিদাস দত্ত। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৯।

৫। কাশিমবাজার ছাড়াও জঙ্গিপুর একসময় রেশম শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে জঙ্গিপুরের কুঁদঘাটের (Tol Tax Ghat) খাতাপত্রে দেখা যায় ৩০,৩২০টি নৌকা এবং ৭ লক্ষাধিক টাকার মালপত্র যাতায়াত করেছে।

৬। ২৪ পরগণা ও সুন্দরবনের নদীপথ, তীর্থস্থান, জনপদের পরিচয় আছে।

৮। ১৮৩৫ সাল থেকে কাঠের নৌকায় মাল পরিবহনের সূচনা। বন্দর না থাকায় জাহাজ গঙ্গায় ভেসে থেকে নৌকায় মাল নামাত। হোরমিলার কোং, এন্ড্রুইউল কোং। ফোর্ট গ্লস্টার কোং, ফ্রেজার কোং, কাঠের নৌকায় পরিবহন ব্যবসায় ফেঁপেফুলে ওঠে। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৯০ সালে হরেড়দ্রনাথ পাল প্রথমে নৌকার ব্যবসা শুরু করেন। বছর খানেকের মধ্যে আর্থিক সমস্যায় পড়ে বি.এল চক্রবর্তীকে অংশীদার নেন। ১৯০২ সালে এদের ৩০টি নৌকা ছিল। ১৯১২ সালে হুগলিত নদীতে লোহার নৌকো চালু হয়। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বন্দরের নানা কাজে ৩৩০০টি লোহার ও ২০০০টি কাঠের নৌকা র্করত ছিল।

৯। এই স্থানগুলির সঙ্গে মেদিনীপুরের হিজলী ও খেজুরীর কথা বলা দরকার। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্রে দেখা যায় তারা ১৭০০ সালে খেজুরিতে একটি Marine yard তৈরির নির্দেশ দিচ্ছেন। র‍্যালফ্ফিচ হিজলী বন্দর থেকে পণ্য রপ্তানির কথা বলেছেন।

১০। তৎকালীন অডিটর জেনারেল স্যার ক্যামেরন ব্যাডেনকের কথায় তা প্রকাশ পেয়েছিল।

১১। ১৮২৫ সালের ১৪ আগস্ট কলকাতা থেকে চুঁচুড়া জলপথে 'ডায়না' নামে একটি স্টিমার চলতে শুরু করে। এর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এন্ডারসন। কলিকাতা গেজেট লিখছে : 'বর্তমানে এই স্টিমার খানি হুগলি নদীতেই ফেরির কাজ করিতেছে। এদেশীয় লোকেরা কলের সহায়তায় জলের উপর জাহাজ চলিতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে নদীর উভয় কূলে সমবেত হইয়া নিত্য মহাজনতা উপস্থিত করে।''

১৮২৬, পূর্বোক্ত এন্ডারসন 'কমেট ও ফায়ার ফ্লাই' নামে দুখানি ভেরি স্টিমার কলকাতায় তৈরি করেন। এগুলো চুঁচুড়া পর্যন্ত যাতায়াত করত। মাথা পিছু ভাড়া ৮টাকা। এবছরই একটি স্টিমার মালদহ পর্যন্ত চালু হয়। 'হুগলী' নামের একটি স্টিমার ১৮২৪ সালে ২৪ দিনে কাশী পৌছেছিল। কলকাতা স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি কলকাতা কালনা পর্যন্ত স্টিমার লাইন চালু করেছিল। স্টেশন ছিল মোট ২০টি। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিক ভারতের জলপথ সুগম করার জন্য স্টিমার নির্মাণে উৎসাহ দেন। বিশেষত: লোহার স্টিমার। ১৮৩২ সালে তাঁর নামে প্রথম লোহার পাতের জাহাজ তৈরি করা হয়। পরের দিকে খিদিরপুর ডক্ ইয়ার্ড থেকে তৈরি হয়— হরিণঘাটা, ব্রহ্মপুত্র, ইন্ডাস, দামোদর, মহানন্দী, নর্মদা। ১৮৪৪ সালে পাকাপাকি ভাবে স্টিমার সার্ভিস চালু হয়। এর প্রদান কর্থা হন ক্যাপ্টেন জনস্টন।

অর একটি বিষয় বলা দরকার। ১৭৬৪-৬৫ সালে জেমস্ রেণেল গঙ্গা জরিপ করেন। ইংরেজ সরকার সারা বছর স্টিমার ও নৌকার জন্য নৌবহত খাত চালু রাখতে ১৯৫৪ নাগাদ একটা পরিকল্পনা নেয়। কর্মেল কটন কলকাতা - রাজমহল যোগাযোগ পরিকল্পনা করেন। তাঁর মতে—''...প্রস্তাবিত কাজগুলি রূপায়িত হলে সারাবছর গঙ্গা উপত্যকায় জলপথ পরিবহন সম্ভব হবে। ...আমি বলতে পারি যে আনুমানিক তি মিলিয়ান স্টার্লিং খরচ করতে পারলে সারা ভারত সাম্রাজ্যকে এক বিশাল জলপথের জালে জড়িয়ে ফেলা যাবে। তখন দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেকোন মালপত্তর অনায়াসে পাঠানো যাবে।''

কিন্তু ইংলন্ডের রেল কোম্পানির কর্তাদের চাপে এই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত করা যায়নি। তারা River of Rail পলিসি চালিয়েছিল। River and Rail নয়।

১২। নৌ- নির্মাণে গাফিলতির তদন্তের জন্য দিল্লী থেকে ব্রিগেডিযার আম্সকে পাঠানো হয়। তিনি কড়া রিপোর্ট দেন। কিঞ্চিৎ খানা তল্লাসিও হয়।

১৩। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ অধ্যায়ে শুরুতে বক্তব্য ছিল : ''বহুযুগ ধরে স্থল ও জলপথ নানা কারণে অবহেলিত হয়ে এসেছে। এতকাল যা কিছু হয়েছে সবই রেলের জন্য। কিন্তু দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে রেলপথের মতো পথঘাট ও জলপথের অবদান কম নয়। সৌভাগ্যবশত ভারতে নদীনালার অভাব নেই।'' জলপথ উন্নয়নের জন্য এসময় ওযাটার ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠিত হয়। কিন্তু বরাদ্দের সময় বাজেটে রেলের জন্য ২০০ কোটি ও সড়ক পথের জন্য ২৩ কোটি এবং জলপথের ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২য় ও ৩য় পরিকল্পনায় জলপথ উন্নয়নে উচ্চবাচ্য করা হয়নি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেকথা স্বীকারও করা হয়। ''গত তিনটি যোজনায় জলপথ পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি হয়নি।''

---

**তথ্য ঋণ - বহুবিধ গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা।**